INDIA IN TRANSITION

Special COVID-19 Series: Part 2

ভারতের তৃতীয় ঢেউ-এর জন্য প্রস্তুতিঃ অতীত থেকে নেওয়া শিক্ষা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

লক্ষ্মী গোপালাকৃষ্ণান, শিপ্রা গ্রোভার, অনুজা জানি এবং বসুন্ধরা রঙ্গস্বামী
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১

২০২১ সালের বসন্তকালের শুরুতে, যখন গ্লোবাল নর্থের অনেক দেশই কোভিড-19 থেকে সেরে উঠতে শুরু করেছে, সেই সময়ই ভারতে এই রোগের সবচেয়ে মারাত্মক ঢেউটি শুরু হয়, যার ফলে দুই কোটি নতুন সংক্রমণ এবং আড়াই লাখের বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। অনেক ভারতীয়র কাছেই এই ঢেউ-এর তীব্রতা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বি.1.617.2 বা ডেল্টা নামের একটি প্রবল সংক্রামক ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও দেশের নাগরিক, সরকারী কর্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতারা নিশ্চিন্ত হয়েই ছিলেন এবং কোভিড নিয়ে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য নেওয়া সমস্ত পদক্ষেপ অবহেলা করেছেন। ২০২১-এর মে মাস আসতে আসতেই দেশে প্রতিদিন চার লাখ পর্যন্ত সংক্রমণ ঘটতে শুরু করে। ছয় দিনের মধ্যেই বিশ্বের দৈনিক সংক্রমণের হিসাবের অর্ধেকের বেশিই ছিল ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা। এর পরে, দ্বিতীয় সংক্রমণের ঢেউ-এর সময় যা ঘটে তা বহু ভারতীয়ের স্মৃতিতেই বারবার ফিরে আসবে।

একটি প্রায় ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর নির্ভরতার কারণে গোটা দেশে চিকিৎসাকর্মী, হাসপাতালে বিছানা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রবল অভাব দেখা দেয়। কোভিডের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে কিনা তা প্রমাণ পর্যন্ত হয় নি এমন ওষুধ কালো বাজারে বিক্রি হয়েছে, কালো ছত্রাক সংক্রমণ বা মিউকরমাইকোসিসের দাপট বেড়েছে। এই মুহূর্তে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার। অনেকের মতেই এই হিসাব আসল সংখ্যার থেকে লজ্জাজনকভাবে কম এবং বাস্তবে মৃতের সংখ্যা সরকারী হিসাবের প্রায় দশগুণ বেশি। বিবৃতিতে মৃত্যুর, বিশেষ করে, দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের ঘটনাগুলির এই রকম নাটকীয় ভাবে কমকরে দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কোভিড-19 অতিমারীর পরিস্থিতির আসল

গুরুত্বকে চাপা দেওয়া। এই অবস্থার পর থেকে সরকার যদিও টিকাদান প্রক্রিয়া ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করছেন, তাহলেও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঢেউগুলি আটকানোর জন্য প্রস্তুত হতে, এই অতিমারীর প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

সংক্রমণ পরীক্ষা এবং চিহ্নিতকরণের মধ্যে চলতে থাকা বৈষম্য

ভারত যখন দ্বিতীয় ঢেউ-এর প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে, বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ তখনও কমছে না এবং তাঁরা ক্রমাগত পরবর্তী ঢেউ-এর ইঙ্গিতের জন্য সতর্ক হয়ে আছেন। একটি সাম্প্রতিক সেরোসার্ভে থেকে জানা গেছে যে টিকা হয় নি যাঁদের তাঁদের মধ্যে বাষট্টি শতাংশের বেশি ব্যক্তিরই সার্স-কোভ-2 রোগের অ্যান্টিবডি আছে। এর পরই, বৈজ্ঞানিকরা সময়ের আগেই বিপদ কেটে গেছে এবং দেশ গোষ্ঠী-সংক্রমণ মুক্ততা বা হার্ড-ইমিউনিটির দিকে এগোচ্ছে বলে ঘোষণা করতে সরকারকে নিষেধ করেছেন। এই ধরনের অনুমান বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, কারণ এই সংক্রমণ মুক্ততা কতদিন থাকে তা এখনো স্পষ্ট নয়। কোভিড-19 রোগের জীবাণুর বিস্তার প্রাথমিকভাবে অসমই রয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যেসব জায়গায় টিকা, পরীক্ষা এবং নজরদারির পরিমাণ কম সেগুলিই পরবর্তী ঢেউ-এর কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয় ঢেউ-এর পর থেকেই ভারতে সংক্রমণ পরীক্ষার হার দুই গুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে। এখন প্রতিদিন প্রতি এক হাজার ব্যক্তিতে ১.৪ জনের পরীক্ষা হচ্ছে। তবে, রিভার্স ট্র্যানস্ক্রিপশান পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশান (আরটি-পিসিআর) নামের বাণিজ্যিক সংক্রমণ পরীক্ষা পদ্ধতিটি কেবলমাত্র কয়েকটি বাছাই করা গবেষণাগারেই পাওয়া যায় এবং তা দেশের ষাট শতাংশ গ্রামবাসীর নাগালের মধ্যে নয়। সম্প্রতি সংক্রমণ পরীক্ষার সংখ্যা যে সামান্য বেড়েছে তার কারণ গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত র‍্যাপিড-অ্যান্টিজেন টেস্টস (আরএটি) এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের পর্যবেক্ষণের জন্য চালিত বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলিকে একত্রে পরীক্ষা বা পুলড টেস্টিং চালনা করা। ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার তৈরি করা, আরটি-পিসিআর ও আরএটি-র জন্য স্থানীয় নমুনা সংগ্রহকেন্দ্র চালু করার পাশাপাশি কম খরচে আরো বিস্তৃতভাবে পুলড টেস্টিং-এর ব্যবস্থা করা এবং লালা ও কুলকুচির নমুনা সংগ্রহের বিষয়টিকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে। এমন অনেক অঞ্চলই আছে যাদের সংক্রমণ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করার তেমন সঙ্গতি নেই। অতিমারীতে রাশ টানার যে প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে, এই ব্যবস্থাগুলি ওই অঞ্চলগুলিতে তারই পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। এই মুহূর্তে, ভারতের নতুন সংক্রমণের ঘটনার অর্ধেকই কেরালায় পাওয়া গেছে। দুশ্চিন্তার বিষয় হল, পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সংক্রমণ পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে সংক্রমণ পরীক্ষার লক্ষ্যস্থির রাখা এবং এমন একটি বহুস্তরীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা নির্মাণের উপর মনোযোগ দেওয়া যা রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়কেন্দ্রিক পরিষেবার উপর জোর দেওয়ার মত দুটি পদক্ষেপ নিয়ে এই রাজ্য

অনেক উপকৃত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ত্রিশটি সংক্রমণের মধ্যে একটিকে ধরতে পারে, সেখানে কেরালা প্রতি দুটি সংক্রমণের মধ্যে একটিকে চিহ্নিত করতে পারছে। এই কারণে, বাকি রাজ্যগুলির কাছে কেরালা একটি আদর্শ হিসাবে কাজ করছে। তবে কেরালাতে যেভাবে ধারাবাহিকভাবে উচ্চহারে সংক্রমণ ঘটছে তা থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে, সময়ের সাথে সাথে নতুন ভ্যারিয়েন্ট উঠে আসার সম্ভাবনা আছে।

আরো তীব্রতর সংক্রমণ ছড়াতে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম নতুন ভ্যারিয়েন্টের তৈরি হয় কিনা তার দিকে নজর রাখার জন্য একটি কার্যকরী পন্থা হল নিয়মিতভাবে জিনোমিক সার্ভেলেন্স পরিচালনা করা। যদিও নমুনা বিশ্লেষণের নিম্নতম সীমা পাঁচ শতাংশ বলে প্রস্তাবিত হলেও, ডিসেম্বর মাস থেকে ভারতে সংক্রমিত নমুনার মাত্র এক শতাংশের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জিনোমিক সার্ভেলেন্সের হার সীমিত হলে বিভিন্ন নতুন স্ট্রেনের হারিয়ে যাওয়ার বিপদ আছে। টিকার প্রসার ও উন্নয়নের ব্যবস্থা নির্ধারণ, জীবাণুঘটিত রোগের সম্প্রসারণ ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা তৈরির জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। আইএনএসএসিওজি নামের যে কেন্দ্রীয় সংস্থা এই ধরনের প্রচেষ্টা পরিচালনা করে তারা সরকারী গবেষণাগারে নমুনা সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা, আঞ্চলিক গবেষণাগারের সিকোয়েন্সিং-এর সামর্থ্য ও অন্যান্য কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা নেওয়ার পদ্ধতি আরো উন্নত করার মত প্রাথমিক বিষয়গুলির উপর জোর দিচ্ছে।

টিকা নেওয়ার হার বাড়লেও, সরবরাহের সমস্যা ও টিকার বিষয়ে দ্বিধার কারণে ভারত এখনো বিপজ্জনক অবস্থাতেই আছে

দ্বিতীয় ঢেউ-এর পর থেকেই ভারত সঠিকভাবেই, টিকাদানের প্রয়াস দ্রুততর করে তুলেছে। মে মাসের এক তারিখ থেকে আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে এসে দেখা যাচ্ছে টিকাদানের সাপ্তাহিক চলমান গড় হার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আগে দিনে কুড়ি লাখ করে টিকার দাগ বা ডোজ দেওয়া হত, কিন্তু এখন এই হার দিনে প্রায় সত্তর লাখ। ইতিমধ্যেই ষাট কোটি ভারতীয় অন্তত এক দাগ কোভিড-19 টিকা পেয়েছেন। অ্যাপেক্স কোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করে, দেশের ভিতরে টিকা তৈরি জোরদার করা এবং টিকার বন্টন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টির কেন্দ্রীকরণ সরবরাহ শৃঙ্খল এবং বন্টন সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে।

সম্প্রতি, কিশোরবয়স্কদের জন্য বিশ্বের প্রথম ডিএনএ টিকা অনুমোদন করে ভারত তার টিকার ভাণ্ডার আরো জোরালো করে তুলেছে। এই মুহূর্তে দেশে মোট ছয় ধরনের টিকা দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন গর্ভবতী মহিলারাও টিকা নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। এই জাতীয় পদক্ষেপকে স্বাগত জানান হলেও যে গতিতে টিকা দেওয়া হচ্ছে তাতে এখনো জনসংখ্যার একটা সুবিশাল অংশের টিকাকরণ বাকি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গোষ্ঠী-সংক্রমণ মুক্ততার প্রস্তাবিত নিম্নতম সীমায় পৌঁছতে ভারতকে তার টিকাদানের হার ত্বরান্বিত করে প্রতি দিন অন্তত দশ কোটি ব্যক্তিকে টিকা দিতে হবে, যেমন ২০২১-এর ২৭ আগস্ট, শুক্রবার হয়েছিল। ভারতের সফল টিকাকরণ কর্মসূচী অন্যান্য নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিকেও প্রভাবিত করছে। বিশ্বব্যাপী টিকা তৈরির কেন্দ্র এবং হু-এর কোভ্যাক্স কার্যক্রমের মুখ্য সরবরাহকারী হিসাবে ভারতে টিকার পরিমাণ বাড়লে বিশ্বব্যাপী টিকার সরবরাহ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সরবরাহ সংক্রান্ত নানা সমস্যার পাশাপাশি, দেশের কিছু অংশে এখনো টিকা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে যা কোভিড-19 সংক্রমণ-মুক্ততা প্রচারকার্যে গুরুতর বিপদ ডেকে আনছে। যদিও টিকা নিয়ে এই কুণ্ঠা সম্বন্ধে কোন সরকারী তথ্য নেই, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা যে বিষয়গুলি সামনে এনেছে সেগুলি হল, নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে বিশ্বাসের অভাব, চালু করার আগে টিকাগুলির কর্মক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কম সময় নেওয়া, এবং সরকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস। টিকা নিলে বন্ধ্যাত্ব, এমনকি মৃত্যু হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এমন জনশ্রুতি এবং টিকার সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে ভয়, বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে। টিকার উপর আস্থা বাড়াতে, বিশেষত দুর্বলতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে, ভারতের উচিত তার সুবিস্তৃত ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীদল, অন্যান্য গণ টিকাকরণ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা ও তৃণমূল স্তরে কর্মরত অসংখ্য সংস্থাকে ব্যবহার করা।

বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে বাড়তে থাকা খাদ্য সংকট

চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত খরচ এবং বারংবার লকডাউন অসংখ্য পরিবারের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বেকারত্ব, সঞ্চয় হ্রাস এবং খাদ্যের জোগান ক্রমশ আরো অনিশ্চিত হয়ে ওঠার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে লড়াই করে চলেছেন। এর ফলে বর্তমান আর্থসামাজিক বিভাজন আরো গভীর করে তুলেছে। ২০২০ সালের কোভিড-19 অতিমারী প্রণোদিত আর্থিক মন্দা অতিরিক্ত সাড়ে সাত কোটি ভারতীয়কে দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে, বিশ্বব্যাপী দারিদ্রের হার প্রায় ষাট শতাংশ বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় ঢেউ এই দুর্দশা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে আরেক প্রস্থ বেকারত্বের স্ফীতি ঘটেছে এবং সাত কোটির বেশি চাকরী হারিয়ে গেছে। অর্থনীতির উপর অতিমারীর প্রভাব গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে মহিলারা যাঁরা সাধারণত অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা কৃষিকাজে নিযুক্ত হন তাঁদের উপরই সবচেয়ে প্রকটভাবে দেখা গেছে। যদিও লিঙ্গ বিভাজন নিয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু ইউএন উওমেনের বিবৃতি অনুযায়ী, অতিমারীর কারণে, পুরুষদের চেয়ে মহিলারাই বেশি করে দারিদ্রের সম্মুখীন হবেন এবং কোন কাজে আবার নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁদের অনেক কম। লিঙ্গ-সংবেদী পন্থা ও সমাধানের ঠিক কতটা প্রয়োজন এর থেকে তা স্পষ্ট হয়।

ভারতের প্রলম্বিত ও অপরিকল্পিত লকডাউনের কারণে কৃষির ক্ষেত্রে শ্রমিক সমস্যা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে, ব্যাপকহারে কাজ এবং আয়ের হার কমে গিয়েছে ও ইতিমধ্যেই তৈরি হওয়া পুষ্টিজনিত সমস্যা আরো বেড়ে গিয়েছে। অতিমারীর আগেই, ষোলটি রাজ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম ওজনের ও প্রবলভাবে দুর্বল পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের সংখ্যা বেড়ে গেছিল। কোভিড-19 সংক্রান্ত লকডাউনের কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও খাদ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা বেড়ে গিয়েছে। সরকারী বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিশুদের দুপুরের খাবার এবং তা থেকে তারা যে পুষ্টি পায় তা প্রভাবিত হয়েছে। দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারের কাছে এই দুপুরের খাবারই জীবনরেখার মত ছিল।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন বা মহাত্মা গান্ধী ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (এমজিএনআরইজিএস)-এর মাধ্যমে কাজের সুযোগ দেওয়া, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান এবং বিনামূল্যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য দেওয়ার মত পদক্ষেপ নিয়ে কেন্দ্রসরকার এই অর্থনৈতিক এবং খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যার কিছুটা সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তবে, কাজের সুযোগের অভাব, নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা চরমসীমায় পৌঁছে যাওয়ার ফলে অতিরিক্ত কর্মীদের কাজে নিতে না পারা, এবং পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশান সিস্টেম (পিডিএস)-কে ডিজিটাইজ করার সময় আধার কার্ডের প্রয়োজনীয়তার মত নানা আমলাতান্ত্রিক বাধাবিপত্তির কারণে এঁরা এই জাতীয় পদক্ষেপের সম্পূর্ণ সুবিধা সব সময় পান না। তবে, মজুদে থাকা অতিরিক্ত খাদ্যকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে খাদ্য পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করবে এমন কিছু কর্মসূচি তৈরি হলে এই দুর্বল গোষ্ঠীগুলি অনেকটাই উপকৃত হবেন। এমজিএনআরএজিএস-কে আরো শক্তিশালী করা, জাতীয় নগর কর্মসংস্থান কর্মসূচি চালু করা এবং কোন রকম নথি বা ডিজিটাল মঞ্চের উপর নির্ভরশীল নয় এমন আরো নমনীয় সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার মত পদক্ষেপ নিয়ে সরকার জীবিকা পুনরুদ্ধার করাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন।

কোভিড-19 অতিমারী ছাড়াও অন্যান্য বিপদ

কোভিড-19 অতিমারীর আরেকটি ঢেউ-এর সম্ভাবনা বা তীব্রতা নিয়ে অনুমান করতে না পারলেও আমরা অন্যান্য আঞ্চলিকভাবে ছড়ান রোগ বা এনডেমিক যা অসংখ্য জীবনহানির কারণ, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের, সেগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে পারি। অতিমারী নিয়ন্ত্রণের রীতিনীতি কোভিড-19 রোগের মতই লক্ষণ আছে এমন সংক্রমণের জন্য কাজে লাগেনি। বিহার ও উত্তর প্রদেশের মত রাজ্যে ডেঙ্গী, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া আর ছোঁয়াচে সর্দিজ্বর জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেড়ে গেছে। বর্ষাকালে তৈরি হওয়া বন্যা পরিস্থিতির ফলে মশাবাহিত এবং ডায়ারিয়া জাতীয় রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। জ্বর, গায়ে ব্যথা, মাথা

ধরা, ডায়ারিয়া এবং কাশির মত লক্ষণ এই রোগগুলির প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়। যেহেতু এই অসুস্থতাগুলির চিকিৎসার নিজস্ব প্রণালীও আছে, তাই ভারতের উচিত জটিল জ্বর জাতীয় রোগের চিকিৎসার জন্য একটি সমন্বিত প্রণালী গ্রহণ করা।

ফুসফুস বা তলপেটের যক্ষা বা টিউবারকুলোসিস (টিবি) রোগে যাঁরা নতুন আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের অসুস্থতার লক্ষণ ও কোভিড-19-এর উপসর্গের সাদৃশ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। এছাড়াও, অতিমারীর সময় লকডাউন, সরবরাহ শৃঙ্খলে সমস্যা এবং চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও রোগনির্ণয় ও শুশ্রূষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কোভিড চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করার ফলে যক্ষা রোগনির্ণয়ের কাজ ব্যাহত হয়েছে। ফলত, সর্বোচ্চ যক্ষার হারসহ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত আদৌ ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষারোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

অবশেষে, কার্ডিওভাসকুলার এবং ডায়াবেটিসের মত অসংক্রামক রোগ, যেগুলির কারণে কোভিড-19-এর সংক্রমণ তীব্রতর হয় বলে জানা গেছে, সেগুলি কেবলমাত্র শহরবাসী ও অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদেরই হতে পারে বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা ভাঙা দরকার। কৃশকায় ব্যক্তিদের মধ্যে যে উচ্চহারে কারডিওভাসকুলার রোগ ও ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা গ্রামাঞ্চলে স্বীকার করা হয় না। সিকল সেল অ্যানিমিয়া ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগের মত সমস্যা, যেগুলি কোভিড-19-এর তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে, সেগুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। বারংবার বিপর্যয়ের ঘটনা এড়াতে মাস্ক ব্যবহার, নিয়মিত হাত ধোয়া, ভেন্টিলেশান, পরিপ্রেক্ষিত বুঝে ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীল যোগাযোগস্থাপন, লক্ষ্যস্থির রেখে প্রাসঙ্গিকভাবে পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা এবং টিকাকরণের বন্দোবস্ত করা একান্তই প্রয়োজন।

লক্ষ্মী গোপালাকৃষ্ণান বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এমপিএইচ-পিএইচডি প্রার্থী।
শিপ্রা গ্রোভার নিউ ইয়র্কের ওয়েইল কর্নেল মেডিসিনের সহযোগী গবেষক।
অনুজা জানি অন্টারিও, লন্ডনের ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এমপিএইচ প্রার্থী।
বসুন্ধরা রঙ্গস্বামী ভারতের একজন প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান, রুরাল হেলথ ফেলো এবং মাইক্রোবায়োলজিস্ট।

লেখকরা ইন্ডিয়া কোভিড এসওএস নামের বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, নীতিনির্ধারক, গোষ্ঠী সংগঠকদের নিয়ে তৈরি একটি আন্তর্জাতিক নন-প্রফিট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গ্রামীণ প্রতিক্রিয়া দলের সদস্য। স্বল্প সম্পদযুক্ত

পরিবেশে, বাড়িতেই কোভিড-19 রোগের মৃদু সংক্রমণের চিকিৎসা কি ভাবে করা যায় তা নিয়ে এই দলটি একটি ইনফোগ্রাফিকও তৈরি করেছেন। এই ইনফোগ্রাফিকটি এখন দশটি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে।